أعوذ باللّٰه من الشيطان الرجيم

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

(Book#.78) www.motaher21.net

١٤. ذكرا كثيرا

" খুব বেশী করে স্মরণ কর।"

" Often praise Allah."

يٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا

হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে বেশি বেশি স্মরণ কর।

৪১ নং আয়াতের তাফসীর:

(اذْكُرُوا اللّٰهَ ذِكْرًا كَثِيْرًا)

এখানে আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে বেশি বেশি আল্লাহ তা'আলার যিকির করার নির্দেশ প্রদান করেছেন ।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন:

(فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيٰمًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰي جُنُوْبِكُمْ)

"যখন তোমরা সালাত সমাপ্ত করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে।" (সূরা নিসা ৪:১০৩)

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন:

(وَالذّٰكِرِيْنَ اللّٰهَ كَثِيْرًا وَّالذّٰكِرٰتِ أَعَدَّ اللّٰهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَّأَجْرًا عَظِيْمًا)

"এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারিণী নারীন এদের জন্য আল্লাহ প্রস্তুত রেখেছেন ক্ষমা ও বিরাট প্রতিদান।" (সূরা আহযাব ৩৩:৩৫)

হাদীসে এসেছে, আবূ দারদা হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমি কি তোমাদেরকে উত্তম কাজ, পবিত্র আমল, সবচেয়ে উচ্চ পর্যায়ের পুণ্য, স্বর্ণ-রৌপ্য আল্লাহ তা'আলার পথে ব্যয় করা অপেক্ষা অধিক উত্তম এবং জিহাদ হতে অধিক মর্যাদাসম্পন্ন কাজের কথা বলব না? সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! সেটা কী? উত্তরে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: আল্লাহ তা'আলার যিকির বা স্মরণ। (আহমাদ ৫/১৯৫, তিরমিযী হা: ৩৩৭৭, ইবনু মাযাহ হা: ৩৭৯০ সনদ সহীহ)

সাওবান (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত তিনি বলেন: যখন স্বর্ণ-রৌপ্যের ব্যাপারে যা নাযিল হওয়ার নাযিল হল তখন সাহাবীগণ বললেন: হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল আমরা কোন সম্পদ গ্রহণ করব? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: মানুষ যেন কৃতজ্ঞ আত্মা, যিকিরকারী রসনা এবং এমন স্ত্রী গ্রহণ করে, যে পরকালীন বিষয়ে সহযোগিতা করবে। (সিলসিলা সহীহাহ হা: ১৫০৫)

আব্দুল্লাহ বিন বুসর (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন দুজন গ্রাম্য লোক নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাছে এসে একজন বলল: হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কোন্ শ্রেণির মানুষ উত্তম? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: যে ব্যক্তি দীর্ঘ আয়ু পেয়েছে এবং তার আমল সুন্দর হয়েছে। অপরজন বললন হে আল্লাহ তা'আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের কাছে ইসলামের বিধিবিধান অনেক হয়ে গেছে, তাই কোন্ আমলের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকব? রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: সর্বদা তোমার জিহবাকে আল্লাহ তা'আলার যিকির দ্বারা সিক্ত রাখবে। (তিরমিযী হা: ৩৩৭৫, ইবনু মাযাহ হা: ৩৭৯৩, সহীহ)

যিকির সম্পর্কে আরো অসংখ্য সহীহ হাদীস বিদ্যমান। তবে এ যিকির করার কিছু পদ্ধতি রয়েছে, তন্মধ্যে একটি হল চুপে চুপে এবং ভয়ের সাথে যিকির করা।

আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(وَاذْكُرْ رَّبَّكَ فِيْ نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَّخِيْفَةً وَّدُوْنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ وَالْاٰصَالِ وَلَا تَكُنْ مِّنَ الْغٰفِلِيْنَ)

“তোমার প্রতিপালককে মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর আর উদাসীনদের মত হয়ো না।” (সূরা আ‘রাফ ৭:১০৫)

তবে যিকির করার অর্থ এই নয় যে, কয়েকজন একত্রে বসে উচ্চৈঃস্বরে হৈ-হুল্লা করে আওয়াজ করা। তুমি এমনভাবে যিকির কর যেন মানুষ তোমাকে পাগল বলেন ইত্যাদি এ ব্যাপারে যে-সকল কথা বর্ণনা করা হয় তা আদৌ সঠিক নয়। (তাফসীর ইবনু কাসীর, অত্র আয়াতের তাফসীর) বরং নম্রভাবে বিশুদ্ধ চিত্তে একমাত্র আল্লাহ তা‘আলার যিকির করতে হবে এবং সকাল-সন্ধ্যায় মহান আল্লাহ তা‘আলার যিকির করতে হবে।

আল্লাহ তা‘আলার বাণী:

(فَسُبْحَانَ اللّٰهِ حِيْنَ تُمْسُوْنَ وَحِيْنَ تُصْبِحُوْنَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَّحِيْنَ تُظْهِرُوْنَ)

“অতঃপর তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও গুণগান প্রকাশ কর সন্ধ্যায় ও প্রত্যুষে। এবং অপরাহ্নে ও যোহরের সময়; আর আসমানে ও জমিনে সকল প্রশংসা তো তাঁরই।” (সূরা রূম ৩০:১৭-১৮)

সুতরাং প্রচলিত ভ্রান্ত যিকির বাদ দিয়ে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক যে সকল যিকির রয়েছে সেগুলো সকাল-সন্ধ্যায় পাঠ করতে হবে। এ যিকিরের ফযীলত সম্পর্কে অন্য একটি হাদীসে বলা হয়েছে, আবূ হুরাইরাহ (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যে ব্যক্তি দিনে একশত বার:

(لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَي كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

-এ দু‘আ পাঠ করবে তার দশটি গোলাম মুক্ত বা আযাদ করার সমান সওয়াব হবে। তার জন্য একশত নেকী লেখা হবে এবং একশত গুনাহ মোচন করে দেয়া হবে এবং তাকে শয়তানের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করা হবে সন্ধ্যা পর্যন্ত। তার থেকে উত্তম আর কেউ হবে না। তবে যে এর চেয়েও বেশি পাঠ করবে সে ব্যতীত। এবং তিনি আরো বলেন: যে ব্যক্তি দিনে একশত বার

“سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ”

এ দু'আ পাঠ করবে তার সমস্ত গুনাহ মোচন করে দেয়া হবে। যদিও তা সমুদ্রের ফেনা পরিমাণ হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৬৪০৩, সহীহ মুসলিম হা: ২৬৯১)

এরপর এর ফযীলত ও এর প্রতি উৎসাহ প্রদান করার জন্য আল্লাহ তা'আলা বলেন: আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন। এতদসত্ত্বেও কি তোমরা আল্লাহ তা'আলার স্মরণ থেকে উদাসীন থাকবে।

আল্লাহ তা'আলার বাণী:

(كَمَآ أَرْسَلْنَا فِيْكُمْ رَسُوْلًا مِّنْكُمْ يَتْلُوْا عَلَيْكُمْ اٰيٰتِنَا وَيُزَكِّيْكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتٰبَ وَالْحِكْمَةَ وَيُعَلِّمُكُمْ مَّا لَمْ تَكُوْنُوْا تَعْلَمُوْنَ - فَاذْكُرُوْنِيْٓ أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ وَلَا تَكْفُرُوْنِ)

"আমি তোমাদের মধ্য হতে এমন এক রাসূল প্রেরণ করেছি যিনি তোমাদের নিকট আমার আয়াতসমূহ পাঠ করেন ও তোমাদেরকে পবিত্র করেন এবং তোমাদেরকে কিতাব ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেন আর তোমরা যা জানতে না তাও শিক্ষা দেন। সুতরাং তোমরা আমাকে স্মরণ কর! আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব আর তোমরা আমার শুকরিয়া আদায় কর ও অকৃতজ্ঞ হয়ো না।" (সূরা বাকারাহ ২:১৫১-১৫২)

হাদীসে এসেছে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আল্লাহ তা'আলা বলেন: যে ব্যক্তি আমাকে একাকী স্মরণ করে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যে আমাকে কোন দলের মধ্যে স্মরণ করে আমি তাকে তার চেয়ে উত্তম (ফেরেশতাদের) দলের মধ্যে স্মরণ করি। (সহীহ বুখারী হা: ৭৪০৫, সহীহ মুসলিম হা: ২৬৭৫)

এমনকি ফেরেশতারাও যিকিরকারীদের জন্য আল্লাহ তা'আলার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে। আল্লাহ তা'আলা বলেন:

(اَلَّذِيْنَ يَحْمِلُوْنَ الْعَرْشَ وَمَنْ حَوْلَهٗ يُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَيُؤْمِنُوْنَ بِهٖ وَيَسْتَغْفِرُوْنَ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ج رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَّحْمَةً وَّ عِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَاتَّبَعُوْا سَبِيْلَكَ وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَحِيْمِ -رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنّٰتِ عَدْنِ نِالَّتِيْ وَعَدْتَّهُمْ وَمَنْ صَلَحَ مِنْ اٰبَآئِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وَذُرِّيّٰتِهِمْ ط إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ)

"যারা আরশ ধারণ করে আছে এবং যারা এর চারপাশে রয়েছে, তারা তাদের প্রতিপালকের পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা করে প্রশংসার সাথে এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং মু'মিনদের জন্য ক্ষমা পার্থনা করে (বলে:) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি সকল কিছুকেই (তোমার) জ্ঞান ও রহমত দ্বারা পরিবেষ্টন করেছ, অতএব যারা তাওবা করে ও তোমার পথের অনুসরণ করে তুমি তাদেরকে ক্ষমা কর এবং তাদেরকে জাহান্নামের শাস্তি হতে রক্ষা কর। হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি তাদেরকে প্রবেশ করাও স্থায়ী জান্নাতে যার অঙ্গীকার

তুমি তাদেরকে দিয়েছ এবং তাদের বাপ-দাদা, স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততির মধ্যে যারা সৎ কর্ম করেছে তাদেরকেও। তুমি তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।" (সূরা মু'মিন ৪০:৭-৯)

এরপর আল্লাহ তা'আলা বলেন: তারা যখন আল্লাহ তা'আলার সাথে সাক্ষাত করবে অর্থাৎ জান্নাতে প্রবেশ করবে তখন তারা তথায় শুধু শান্তিপূর্ণ অভিবাদন শুনবে। এ সম্পর্কে সূরা ইউনুসের প্রথম দিকে আলোচনা করা হয়েছে।

ব্যাপারেই কোন না কোন রকমে আল্লাহর নাম উচ্চারিত হবে। কোন লোকের মধ্যে এরূপ অবস্থার সৃষ্টি ততক্ষণ পর্যন্ত হয়না যতক্ষণ তার হৃদয়ে আল্লাহর চিন্তা খেয়াল সম্পূর্ণ দৃঢ়মূল হয়ে না যাবে। চেতনার স্তর থেকে অবচেতন ও অনবচেতন পর্যন্ত আল্লাহর চিন্তা গভীর হয়ে গেলেই একজন লোকের অবস্থা এরূপ হতে পারে যে, সে যে কাজই করবে আর যে কথাই বলবে তাতে আল্লাহর নাম অবশ্যই উচ্চারিত হবে। খাওয়ার প্রথমে বিসমিল্লাহ বলবে, খাওয়ার শেষে আলহামদুলিল্লাহ বলবে। বিছানায় শুয়ে সে আল্লাহর নাম স্মরণ করবে। ঘুম ভাংগলে ও শয্যা ত্যাগ করতে গিয়ে সে আল্লাহর নাম নেবে। সাধারণ কথা বার্তায় বারে বারে তার মুখে বিসমিল্লাহ, আলহামদুলিল্লাহ, ইনশাআল্লাহ, মাশাআল্লাহ, সুবহানাল্লাহ ও অনুরূপ অর্থের অন্যান্য বাক্যও তার মুখ থেকে বের হতে থাকবে। নিজের সব ব্যাপারে আল্লাহর নিকট সাহায্য চাবে, যে কোন নিয়ামাত পাবে আল্লাহর নিকট শুকর করবে। বিপদ আপদে আল্লাহর রহমতের জন্য প্রার্থনা করবে। প্রত্যেক জটিলতা ও সমস্যায় কেবল আল্লাহর দিকে মুখ করবে। যে কোন অন্যায় ও পাপ কাজের সুযোগ আসবে তখনি কেবল আল্লাহকে ভয় করেই তা থেকে বিরত থাকবে। যে কোন অপরাধ হয়ে গেলে কালবিলম্ব না করে আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাবে। যে কোন প্রয়োজন দেখা দেবে তার জন্য আল্লাহর নিকট দোয়া করবে। মোট কথা, উঠতে, বসতে, চলতে-ফিরতে ও দুনিয়ার সব কাজ করতে আল্লাহর স্মরণ ও আল্লাহর নাম করাই হবে তার স্থায়ী নিয়ম। প্রকৃতপক্ষে এটাই হচ্ছে ইসলামী জীবনের প্রাণশক্তি। ইসলাম নির্ধারিত সবগুলো এবাদাতের জন্যই কোন না কোন সময় নির্দিষ্ট রয়েছে। সে সময়ই উহা আদায় করা হয় আর আদায় হয়ে গেলে মানুষ তা থেকে অবসর পায়। কিন্তু আল্লাহর স্মরণ এমন এক ইবাদাত যাহা প্রতিটি মুহূর্ত ও সকল সময়, সকল অবস্থায়ই জারী থাকে। আর মানব জীবনের এই সম্পর্ক তাকে আল্লাহ ও তাঁর বান্দাহ হওয়ার সাথে স্থায়ীভাবে যুক্ত করে রাখে। যাবতীয় এবাদত ও সমগ্র দ্বীনি কাজ এর সাহায্যেই সঞ্জীবিত হয়ে উঠে। এর ফলে বিশেষ বিশেষ আমল বা ইবাদাতের সময় ছাড়াও আল্লাহর দিকে মন উন্মুখ হয়ে থাকে, মুখ সব সময়ই আল্লাহর স্মরণে সিক্ত থাকে। যদি বাস্তবিকই এরূপ অবস্থা কারো হয় তবে তার জীবনে তার ইবাদাত ও যাবতীয় কাজ উৎকর্ষ লাভ করে।

অতএব আমাদের উচিত নিজের জীবনে এই অবস্থা অর্জন করার চেষ্টা করা।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. যিকির করতে হবে একমাত্র আল্লাহ তা'আলার জন্য। নম্রভাবে ভয়ের সাথে চুপে চুপে এবং সহীহ সুন্নাহ মোতাবেক।

২. সকাল-সন্ধ্যায় অর্থাৎ সর্বক্ষণ আল্লাহ তা'আলার তাসবীহ পাঠ করতে হবে।

৩. ফেরেশতারা মু'মিনদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করেন।

৪. জান্নাতে শান্তিপূর্ণ অভিবাদন ছাড়া আর কিছুই সেখানে থাকবে না।

يَٰٓأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَآءَتْكُمْ جُنُودٌ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا وَجُنُودًا لَّمْ تَرَوْهَا ۚ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا

হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন সৈন্যবাহিনী তোমাদের বিরুদ্ধে নিকটবর্তী হয়েছিল, অতঃপর আমি তাদের বিরুদ্ধে পাঠিয়েছিলাম ঝড়ো হাওয়া এবং এক (ফেরেশতারূপী) সৈন্যবাহিনী যা তোমরা দেখনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তা প্রত্যক্ষকারী।

৯ নং আয়াতের তাফসীর:

উক্ত আয়াতসমূহে পঞ্চম হিজরীতে সংঘটিত আহযাব যুদ্ধের কিছু বিস্তারিত বর্ণনা রয়েছে। এই যুদ্ধকে 'আহযাব' এই জন্য বলা হয় যে, এই সময় ইসলামের সকল শত্রুবাহিনী একত্রিত হয়ে মুসলিমদের ঘাঁটি 'মদীনার' উপর আক্রমণ করেছিল। 'আহযাব' 'হিযব' শব্দের বহুবচন, যার অর্থ বাহিনী বা দল। একে খন্দকের যুদ্ধও বলা হয়, কারণ মুসলিমগণ নিজেদের নিরাপত্তার জন্য মদীনার একপাশে খাল খনন করেন। যাতে শত্রুবাহিনী মদীনা শহরের ভিতরে প্রবেশ করতে না পারে। (খন্দক মানে খাল বা পরিখা।) উক্ত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত বিবরণ এইরূপ যে, ইয়াহুদী গোত্র বানু নাযীর; যাদেরকে বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারা খায়বারে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তারা মক্কার কাফেরদেরকে মুসলিমদের উপর আক্রমণ করার জন্য তৈরী করল। অনুরূপ গাত্বফান ইত্যাদি গোত্র নাম্ডের গোত্রগুলোকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করল। সুতরাং ইয়াহুদীরা অনায়াসে ইসলাম ও মুসলিমদের সকল শত্রুদেরকে একত্রিত করে মদীনার উপর আক্রমণ করতে সফল হল। মক্কার মুশরিকদের কমান্ডার ছিল আবু সুফিয়ান। সে উহুদ পর্বতের আশেপাশে শিবির স্থাপন করে প্রায় পুরো মদীনাকে পরিবেষ্টন করে নিল। তাদের সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। আর মুসলিমগণ ছিলেন মাত্র তিন হাজার। এ ছাড়াও মদীনার দক্ষিণ দিকে ইয়াহুদীদের তৃতীয় গোত্র বানু কুরাইযা বাস করত; যাদের সাথে সেই সময় পর্যন্ত মুসলিমদের চুক্তি ছিল এবং তারা মুসলিমদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকারবদ্ধ ছিল। কিন্তু বানী

নাযবীরের ইয়াহুদী সর্দার হুয়াই বিন আখত্বাব মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ফুসলিয়ে নিজেদের সাথে করে নিল। এদিকে মুসলিমগণ সর্বদিক দিয়ে শত্রুবাহিনীর পরিবেষ্টনে পড়ে গেলেন। সেই সংকটাবস্থায় সালমান ফারেসী (রাঃ)-এর পরামর্শে পরিখা খনন করা হল। যার ফলে শত্রু বাহিনী মদীনার ভিতর প্রবেশ করতে সক্ষম হল না; বরং মদীনার বাইরেই থাকতে বাধ্য হল। তারপরেও মুসলিমগণ সেই পরিবেষ্টন ও সম্মিলিত শত্রুবাহিনীর আক্রমণের ভয়ে ভীত ছিলেন। প্রায় এক মাস যাবৎ এই পরিবেষ্টনে মুসলিমগণ কঠিন ভয় ও দুশ্চিন্তায় কালাতিপাত করেন। পরিশেষে মহান আল্লাহ মুসলিমদেরকে গায়বী সাহায্য করলেন। উক্ত আয়াতগুলিতে সেই কঠিন অবস্থা ও গায়বী সাহায্যের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। প্রথম جنود থেকে উদ্দেশ্য হল কাফেরদের শত্রুবাহিনী যারা সম্মিলিত হয়ে এসেছিল। 'ঝড়' বলতে ঐ প্রবল হাওয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা তুফানরূপে এসে তাদের তাঁবু উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, পশুর দল রশি ছিঁড়ে পালিয়েছিল, ডেগগুলি উল্টে গিয়েছিল এবং তারা সকলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এই ঝড় সম্পর্কে হাদীসে বর্ণনা পাওয়া যায় যে, মহানবী (সাঃ) বলেছেন, "আমাকে পুবালী হাওয়া দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আদ সম্প্রদায়কে পশ্চিমী হাওয়া দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে।" (বুখারীঃ ইস্তিস্কা অধ্যায়) (وَجُنُوْدًا لَّمْ تَرَوْهَا) এর অর্থ হল ফিরিশতা; যারা মুসলিমদের সাহায্যের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা শত্রুবাহিনীর মনে এমন ভয় ও ত্রাস সঞ্চার করেন যে, তারা সেখান থেকে অবিলম্বে পালিয়ে যাওয়াকেই নিজেদের কল্যাণ মনে করেছিল।

৫ম হিজরীতে মুসলিম ও মক্কার কুরাইশসহ মদীনার ইয়াহুদী আর আশপাশের বিভিন্ন গোত্রের মাঝে আহযাব অর্থাৎ খন্দকের যুদ্ধ সংঘটিত হয়। এ যুদ্ধে তাদের মুকাবেলা করা ছিল খুবই কঠিন। এ কঠিন মুহূর্তে মুসলিম বাহিনীকে আল্লাহ তা'আলা যে গায়েবী মদদ দিয়ে সহযোগিতা করেছিলেন সে নেয়ামতের কথা স্মরণ করার জন্য মু'মিনদের নির্দেশ দেয়া হচ্ছে। আয়াতে প্রথমত 'جنود' বলতে শত্র"বাহনীদেরকে বুঝানো হয়েছে। যখন শত্র"বাহিনী মুসলিম বাহিনীর ওপর আক্রমণ করার উপক্রম হয়েছিল তখনই আল্লাহ তা'আলা তাঁর গায়েবী মদদ দ্বারা মুসলিম বাহিনীকে রক্ষা করলেন। আল্লাহ তা'আলার সে সময় যে নেয়ামতসমূহ দিয়েছিলেন তা হলন

১. বাতাস বা ঝড়। এর দ্বারা ঐ প্রবল হওয়াকে বুঝানো হয়েছে, যা তুফানরূপে এসে শত্র"দের তাঁবু উড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছিল, পশুর দল রশি ছিঁড়ে পালিয়েছিল, হাড়ি-পাতিল উল্টে গিয়েছিল এবং তারা সকলে পালিয়ে যেতে বাধ্য হয়েছিল। এ ঝড় সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: আমাকে পূবালী হাওয়া দ্বারা সাহায্য করা হয়েছে এবং আ'দ জাতিকে পশ্চিমা হওয়া দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছে। (সহীহ বুখারী হা: ১০৩৫, সহীহ মুসলিম হা: ৯০০)

২. দ্বিতীয় 'جنود' বা সৈন্য দ্বারা ফেরেশতাদের বাহিনীকে বুঝানো হয়েছে। তারা শত্র"দের মনে এমন ভয় ও ত্রাস সঞ্চার করে দিয়েছে যে, তারা (শত্র" বাহিনী) সেখান থেকে পালিয়ে যাওয়াটাই নিজেদের জন্য কল্যাণকর মনে করেছিল।

'من فوقكم' দ্বারা উচ্চাঞ্চল অর্থাৎ গাতফান, হওয়াযিন এবং নাজদের অন্যান্য মুশরিক বাহিনীরা উদ্দেশ্য, তারাও মুসলিমদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দেয়ার জন্য এসেছিল।

من أسفل منكم এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল কুরাইশ এবং তাদের সাহায্যকারীরা।

আহযাব যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত ঘটনা:

ইয়াহূদী গোত্র বানু নাযীর; যাদেরকে বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গ করার ফলে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) মদীনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলেন, তারা খায়বারে গিয়ে বসবাস শুরু করে। তারা মক্কার কাফিরদেরকে মুসলিমদের ওপর আক্রমণ করার জন্য তৈরী করল। অনুরূপ গাতফান, নাজদের গোত্রসহ অন্যান্য গোত্রগুলোকে সাহায্যের আশ্বাস দিয়ে লড়াইয়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করল। সুতরাং ইয়াহূদীরা অনায়াসে ইসলাম ও মুসলিমদের সকল শত্র"দেরকে একত্রিত করে মদীনায় আক্রমণ করতে সাহস পেল।

মক্কার মুশরিকদের কমান্ডার ছিল আবূ সফিয়ান। সে উহূদ পর্বতের আশেপাশে শিবির স্থাপন করে প্রায় পুরো মদীনা পরিবেষ্টন করে নিল। তাদের সম্মিলিত বাহিনীর সংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার। আর মুসলিমগণ ছিলেন মাত্র তিন হাজার। এ ছাড়াও মদীনার দক্ষিণ দিকে ইয়াহূদীদের তৃতীয় গোত্র বানু কুরাইযা বাস করত; যাদের সাথে তখনও মুসলিদের চুক্তি ছিল এবং তারা মুসলিমদেরকে সাহায্য করার ব্যাপারে অঙ্গীকারাবদ্ধ ছিল। কিন্তু বানু নাযীরের ইয়াহূদী সর্দার হুয়াই বিন আখত্বাব মুসলিমদেরকে সমূলে ধ্বংস করে দেয়ার উদ্দেশ্যে তাদেরকে ফুসলিয়ে নিজেদের সাথে করে নিল। এদিকে মুসলিম বাহিনী সর্বদিক দিয়ে শত্র" বাহিনী দ্বারা পরিবেষ্টিত হয়ে পড়ল।

সেই সঙ্কটাপন্ন অবস্থায় সালমান ফারসীর (রাঃ) পরামর্শে পরিখা খনন করা হল। যার ফলে শত্র" বাহিনী মদীনার ভিতরে প্রবেশ করতে সক্ষম হল না। বরং মদীনার বাইরেই থাকতে বাধ্য হল। তখন মুসলিম বাহিনী তাদের এ পরিবেষ্টনে আতঙ্কিত হয়ে পড়ে। এমনকি তাদের চক্ষু স্থির হয়ে গিয়েছিল। প্রাণ কণ্ঠাগত হয়ে পড়েছিল এবং তারা এ বিপদের সম্মুখীন হয়ে আল্লাহ তা'আলা সম্বন্ধে নানাবিধ কু-ধারণা পোষণ করতে শুরু করেছিল। ঠিক ঐ মুর্হূতেই মহান আল্লাহ তা'আলা মুসলিম বাহিনীকে গায়েবী সাহায্যস্বরূপ বাতাস ও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করেছিলেন।

আনাস (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন খন্দকের দিকে আগমন করলেন তখন প্রত্যক্ষ করলেন যে, শীতের সকালে আনসার ও মুহাজিরগণ পরিখা খনন করছেন। তাদের নিকট এমন কোন দাস নেই যে, তাদের পরিবর্তে দাসগণ ঐ কাজ করবে। তাদের কষ্ট এবং ক্ষুধার ভাব দেখে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন:

اللَّهُمَّ إِنَّ العَيْشَ عَيْشُ الآخِرَهْ، فَاغْفِرْ لِلْأَنْصَارِ وَالمُهَاجِرَهْ

হে আল্লাহ তা'আলা! পরকালের জীবনই তো প্রকৃত জীবন, অতএব আনসার ও মুহাজিরদেরকে ক্ষমা করে দাও। আনসার ও মুহাজিররা প্রত্যুত্তরে বললেন:

نَحْنُ الَّذِينَ بَايَعُوا مُحَمَّدَا ... عَلَي الجِهَادِ مَا بَقِينَا أَبَدَا

আমরা সেই ব্যক্তি যারা মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হস্তে বাইয়াত করেছি যে, যতদিন জীবিত থাকব ততদিন জিহাদ করব। (সহীহ বুখারী হা: ২৮৩৪)

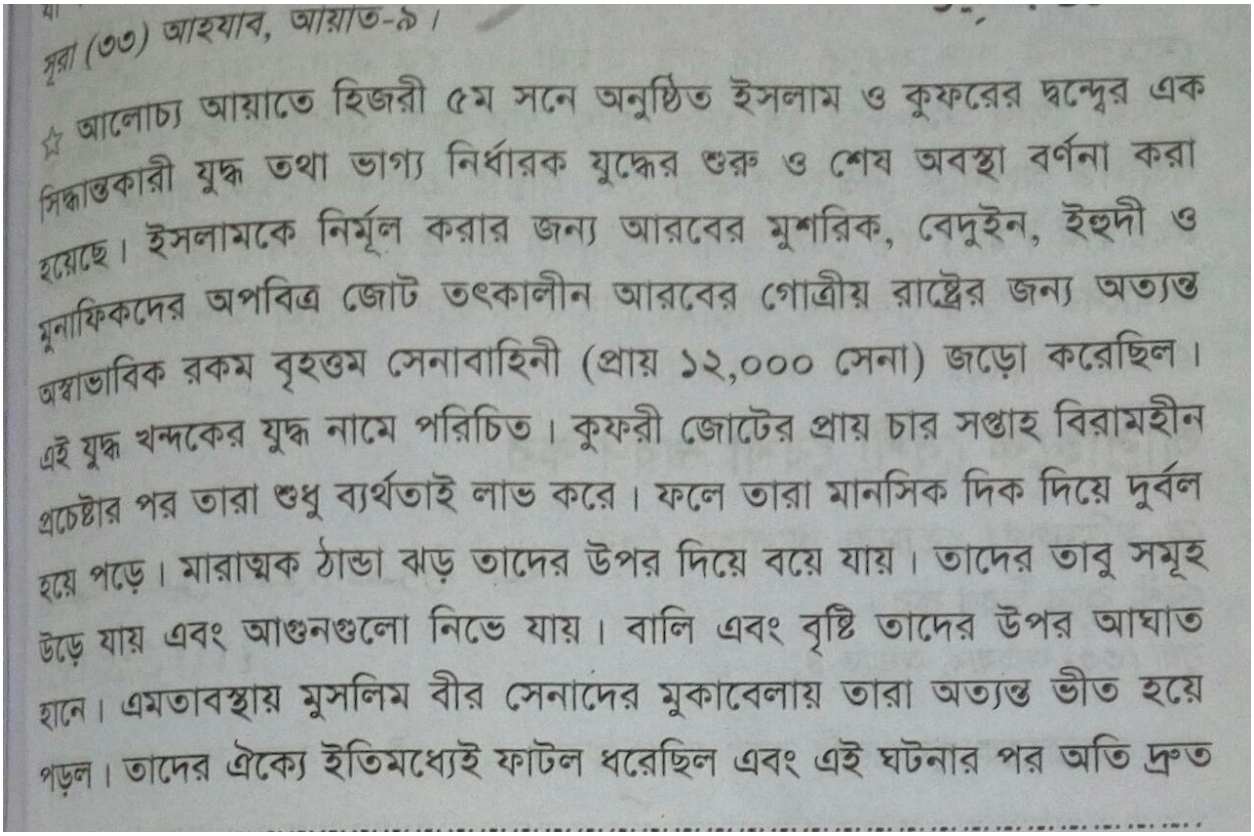

সূরা (৩৩) আহযাব, আয়াত-৯।

☆ আলোচ্য আয়াতে হিজরী ৫ম সনে অনুষ্ঠিত ইসলাম ও কুফরের দ্বন্দ্বের এক সিদ্ধান্তকারী যুদ্ধ তথা ভাগ্য নির্ধারক যুদ্ধের শুরু ও শেষ অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। ইসলামকে নির্মূল করার জন্য আরবের মুশরিক, বেদুইন, ইহুদী ও মুনাফিকদের অপবিত্র জোট তৎকালীন আরবের গোত্রীয় রাষ্ট্রের জন্য অত্যন্ত অস্বাভাবিক রকম বৃহত্তম সেনাবাহিনী (প্রায় ১২,০০০ সেনা) জড়ো করেছিল। এই যুদ্ধ খন্দকের যুদ্ধ নামে পরিচিত। কুফরী জোটের প্রায় চার সপ্তাহ বিরামহীন প্রচেষ্টার পর তারা শুধু ব্যর্থতাই লাভ করে। ফলে তারা মানসিক দিক দিয়ে দুর্বল হয়ে পড়ে। মারাত্মক ঠান্ডা ঝড় তাদের উপর দিয়ে বয়ে যায়। তাদের তাবু সমূহ উড়ে যায় এবং আগুনগুলো নিভে যায়। বালি এবং বৃষ্টি তাদের উপর আঘাত হানে। এমতাবস্থায় মুসলিম বীর সেনাদের মুকাবেলায় তারা অত্যন্ত ভীত হয়ে পড়ল। তাদের ঐক্যে ইতিমধ্যেই ফাটল ধরেছিল এবং এই ঘটনার পর অতি দ্রুত

তারা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হয়ে পালিয়ে গেল। অথচ মদিনার যোদ্ধা (মুসলিমরা) সর্বসাকুল্যে তিন হাজারের বেশী ছিলনা। এরই মধ্যে মুসলমানদের মিত্র ইহুদী গোত্র বনু কুরাইয়া গোপনে বিদ্রোহ করে শত্রুপক্ষে যোগ দেয়। তাছাড়া মুনাফিকরাও গোপনে শত্রুপক্ষের সাথে আঁতাত করে। কিন্তু গোপন শক্তি মুসলমানদেরকে সাহায্য করে। তাদেরকে প্রাকৃতিক শক্তি ও নৈতিক শক্তি সহায়তা করে। শত্রু বাহিনীতে ছিল পারস্পরিক অবিশ্বাস আর মুসলিম বাহিনীতে ছিল যথার্থ শৃংখলা এবং সর্বোপরি রাসূল (সঃ) এর অতুলনীয় নেতৃত্ব। এছাড়াও "গোচরীভূত না হওয়া সৈন্যবাহিনী" বলতে বুঝানো হয়েছে যারা মানুষের যাবতীয় ব্যাপারে আল্লাহর ইশারায় কাজ করে। অথচ মানুষ তা জানতে পারেনা। মানুষতো যাবতীয় ঘটনা ও দুর্ঘটনার বাহ্যিক চেহারাই দেখতে পায়, বাহ্যিক কার্যকারণের দৃষ্টিতে তার ব্যাখ্যা দিতে চেষ্টা করে। কিন্তু ভেতর ভেতর, লোক চক্ষুর অন্তরালে যেসব শক্তি কাজ করে তা মানুষের হিসাবে আসেনা। অথচ অনেক ক্ষেত্রে এই অদৃশ্য শক্তিই চুড়ান্ত সিদ্ধান্তকারী হয়ে থাকে। আল্লাহ যেহেতু সবকিছু দেখেন সুতরাং তিনি মুসলমানদের জীবন সংগ্রামের বিপরীতে কাফেরদেরকে পরাজিত করেছেন। যেখানে পার্থিব দৃষ্টিকোণ থেকে বিজয়তো দুরের কথা আত্মরক্ষা করতে পারার নূন্যতম সম্ভাবনাও ছিলনা, সেখানে কাফের জোট সম্পূর্ণ বিধস্ত হওয়া এবং মুসলমানদের চুড়ান্ত বিজয় একমাত্র আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীর ফলেই সম্ভব হয়েছে। এই মেহেরবানী এর পূর্বেও বর্ষিত হয়েছিল এবং এর পরেও বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। বর্তমানেও আমরা এ মেহেরবানী লাভ করতে পারি যদি আমরা এর হক আদায় করি। অর্থাৎ যদি আমরা যথার্থ ঈমানদার হই এবং যথার্থ তাকওয়ার অধিকারী হই। নমরুদের প্রজ্বলিত আগুনকে নিভানোর জন্য সেই আল্লাহ এখনো বর্তমান আছেন। কিন্তু ইবরাহীম (আঃ) এর সেই ঈমান প্রয়োজন তা প্রত্যক্ষ করার জন্য। অতএব আমাদের কর্তব্য সবসময় আল্লাহর নিয়ামতরাজীর শুকরিয়া আদায় করা এবং একমাত্র আল্লাহর উপরই ভরসা করা।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. আল্লাহ তা'আলা তাঁর মু'মিন বান্দাদেরকে বিপদ-আপদের মাধ্যমে ঈমান পরীক্ষা করেন ।

২. মু'মিনদেরকে আল্লাহ তা'আলার সাহায্য করা কর্তব্য।

৩. সংখ্যা বেশি হলেই যে বিজয়ী হওয়া যাবে এমনটি মনে করা ঠিক নয়।

৪. পূবালী বাতাস রহমতস্বরূপ আর পশ্চিমা বাতাস হল আযাবস্বরূপ।

সুরা: আল-আহযাব

আয়াত নং :-৫৩

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتَ النَّبِيِّ اِلَّاۤ اَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ اِلٰى طَعَامٍ غَيْرَ نٰظِرِيْنَ اِنٰىهُ وَ لٰكِنْ اِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا فَاِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَ لَا مُسْتَاْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِى النَّبِىَّ فَيَسْتَحْىٖ مِنْكُمْ وَ اللّٰهُ لَا يَسْتَحْىٖ مِنَ الْحَقِّ وَ اِذَا سَاَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْـَٔلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَآءِ حِجَابٍ ذٰلِكُمْ اَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَ قُلُوْبِهِنَّ وَ مَا كَانَ لَكُمْ اَنْ تُؤْذُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَ لَاۤ اَنْ تَنْكِحُوْۤا اَزْوَاجَهٗ مِنْۢ بَعْدِهٖۤ اَبَدًا اِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ عِنْدَ اللّٰهِ عَظِيْمًا

হে ঈমানদারগণ! নবী গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না, খাবার সময়ের অপেক্ষায়ও থেকো না। হ্যাঁ, যদি তোমাদের খাবার জন্য ডাকা হয়, তাহলে অবশ্যই এসো৯৬ কিন্তু খাওয়া হয়ে গেলে চলে যাও, কথাবার্তায় মশগুল হয়ে পড়ো না। তোমাদের এসব আচরণ নবীকে কষ্ট দেয় কিন্তু তিনি লজ্জায় কিছু বলেন না এবং আল্লাহ হককথা বলতে লজ্জা করেন না। নবীর স্ত্রীদের কাছে যদি তোমাদের কিছু চাইতে হয় তাহলে পর্দার পেছন থেকে চাও। এটা তোমাদের এবং তাদের মনের পবিত্রতার জন্য বেশী উপযোগী।তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয়া মোটেই জায়েয নয় এবং তাঁর পরে তাঁর স্ত্রীদেরকে বিয়ে করাও জায়েয নয়, এটা আল্লাহর দৃষ্টিতে মস্তবড় গোনাহ।

৫৩ নং আয়াতের তাফসীর:

(أَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا.....) শানে নুযূল:

আনাস বিন মালিক (رضي الله عنه) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: যখন রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যয়নব বিনতে জাহাশ (رضي الله عنها)-কে বিবাহ করলেন তখন লোকদেরকে দাওয়াত করলেন। তারা খাওয়া-দাওয়া শেষে বসে আলোচনা করছিল বা কথাবার্তা বলছিল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উঠার জন্য তৈরী হলেন কিন্তু তখনো তারা উঠল না। তা দেখে তিনি উঠে গেলেন এবং কিছু লোক তাঁর সাথে উঠে চলে গেল। কিন্তু এরপরেও তিনজন লোক বসে থাকল। রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বাড়িতে প্রবেশ করার উদ্দেশ্যে আসলেন। তখনো তারা বসেছিল। এরপর তারা উঠে চলে গেল। আনাস বলেন: আমি আসলাম এবং নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে সংবাদ দিলাম যে, তারা

চলে গেছে। তখন নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসে ঘরে প্রবেশ করলেন। আমি তাঁর সাথে প্রবেশ করতে চাইলাম। কিন্তু তিনি আমার ও তাঁর মধ্যে পর্দা ঝুলিয়ে দিলেন। তখন আল্লাহ তা‘আলা এ আয়াত নাযিল করেন। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৯১ন৯৪, সহীহ মুসলিম হা: ৮৬, ১৪২৮)

এ আয়াতে কিছু সামাজিক বিধি-বিধান উল্লেখ করা হয়েছে তা হচ্ছে:

১. আয়াতের প্রথমাংশে দাওয়াত ও আপ্যায়ন সম্পর্কিত তিনটি রীতি-নীতি বর্ণিত হয়েছে। এগুলো সকল মুসলিমদের জন্য ব্যাপকভাবে প্রযোজ্য। কিন্তু যে ঘটনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়েছে তা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহে সংঘটিত হয়েছে, তাই শিরোনামে بُيُوْتَ النَّبِيِّ উল্লেখ করা হয়েছে।

প্রথম রীতি হল-

নাবী (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর গৃহসহ অন্য যেকোন মু’মিন ব্যক্তির গৃহে অনুমতি ছাড়া প্রবেশ না করা। অন্যত্র আল্লাহ তা‘আলা বলেন:

(يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَدْخُلُوْا بُيُوْتًا غَيْرَ بُيُوْتِكُمْ حَتّٰي تَسْتَأْنِسُوْا وَتُسَلِّمُوْا عَلٰٓي أَهْلِهَا ط ذٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُوْنَ)

“হে মু’মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ কর না। এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, সম্ভবত তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবে।” (সূরা নূর ২৪:২৭)

দ্বিতীয় রীতি হলন প্রবেশের অনুমতি এমনকি খাওয়ার দাওয়াত হলেও সময়ের পূর্বে উপস্থিত হয়ে আহার্য প্রস্তুতির অপেক্ষায় বসে থেকো না।

(غَيْرَ نٰظِرِيْنَ إِنٰهُ)-ناظر

-শব্দের অর্থ এখানে অপেক্ষাকারী এবং انا শব্দের অর্থ খাদ্য রান্না করা। আয়াতে لَا تَدْخُلُوْا নিষেধাজ্ঞা থেকে দুটি ব্যতিক্রম প্রকাশ করা হয়েছে। একটি

(إِلَّآ أَنْ يُّؤْذَنَ لَكُمْ)

এর إِلَّا শব্দ দ্বারা অপরটি غَيْرَ শব্দ দ্বারা। এর অর্থ এই যে, বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করো না এবং সময়ের পূর্বে এসে খাদ্য রান্নার অপেক্ষায় বসে থেকো না বরং যথাসময়ে আহ্বান করা হলে গৃহে প্রবেশ করবে। তাই বলা হয়েছে:

(وَلٰكِنْ إِذَا دُعِيْتُمْ فَادْخُلُوْا)

'তবে তোমাদেরকে ডাকা হলে তোমরা প্রবেশ কর'

তৃতীয় রীতি হলন খাওয়া শেষে নিজ নিজ কাজে ছড়িয়ে পড়। পরস্পর কথাবার্তা বলার জন্য গৃহে অনড় হয়ে বসে থেকো না। তাই বলা হয়েছে:

(فَإِذَا طَعِمْتُمْ فَانْتَشِرُوْا وَلَا مُسْتَأْنِسِيْنَ لِحَدِيْثٍ)

'এবং খাওয়া শেষ হলে নিজেরাই চলে যাও, কথাবার্তায় মাশগুল হয়ে পড় না।'

তবে এ রীতি সে ক্ষেত্রে প্রযোজ্য যেখানে খাওয়ার পর দাওয়াত প্রাপ্তদের বেশিক্ষণ বসে থাকা দাওয়াতকারীর জন্য কষ্টের কারণ হয়। যেমন সে এ কাজ সেরে অন্য কোন কাজে জড়িত হতে চায় কিংবা তাদেরকে বিদায় দিয়ে অন্য মেহমানদেরকে খাওয়াতে চায়। উভয় অবস্থায় দাওয়াত প্রাপ্তদের বসে থাকা তার জন্য কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেখানে যদি পরিবেশ পরিস্থিতি এমন না হয় বরং বসে থাকার সুযোগ রাখা হয়েছে তাহলে ইচ্ছা করলে থাকতে পারবে যেমন এখনকার অধিকাংশ দাওয়াতী আয়োজনে ব্যবস্থা করা হয়।

(إِنَّ ذٰلِكُمْ كَانَ يُؤْذِي النَّبِيَّ)

অর্থাৎ দাওয়াত খাওয়ার পরেও অনর্থক বসে খোশগল্প করায় রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে কষ্ট দেয়া হয়, কারণ তোমরা উঠে চলে যাও এ কথা বলতেও তিনি লজ্জা পান। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা সত্য প্রকাশ করতে লজ্জাবোধ করেন না, তাই তিনি আয়াত নাযিল করে জানিয়ে দিলেন।

তাই মু'মিনদের উচিত বিনা অনুমতিতে কারো গৃহে প্রবেশ না করা এবং যদি অনুমতি দেয়া হয় তাহলে প্রয়োজন সেরে তৎক্ষণাৎ চলে যাওয়া।

ইবনে উমার (رضي الله عنهما) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন: রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন: তোমাদের কেউ যদি তার ভাইকে দাওয়াত করে তাহলে সে যেন তার ভাইয়ের ডাকে সাড়া দেয়। সেটি বিবাহের ওলিমা হোক বা অন্য কিছু হোক। (সহীহ মুসলিম হা: ১০৫৩)

অন্য একটি হাদীসে রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন: যদি আমাকে একটি হাড়ের জন্যও দাওয়াত করা হত আমি তার ডাকে সাড়া দিতাম। আমাকে যদি একটি খুরও হাদিয়া দেয়া হত আমি কবূল করতাম। যখন তোমাদের কাউকে দাওয়াত করা হয় তখন সে যেন খাবার শেষে সেখান থেকে সরে পড়ে। (সহীহ বুখারী হা: ৫১৭৮) অনুমতি চাওয়া সম্পর্কেও সূরা নূরে আলোচনা করা হয়েছে।

২. (وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَسْئَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاْءِ حِجَابٍ)

‘তোমরা যখন তাঁর স্ত্রীদের কাছ থেকে কোন কিছু চাও, তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও’ অত্র আয়াতে যদিও নাবী পত্নীদের কথা বলা হয়েছে যে, তোমরা যখন তাদের নিকট কোন কিছু চাও তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও, কিন্তু এর দ্বারা সকল মু’মিনা নারীদেরকে উদ্দেশ্য করা হয়েছে। আর এ বিধান উমার (رضي الله عنه) -এর বাসনার প্রেক্ষিতে নাযিল হয়। তিনি রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-কে আরজ করলেন যে, হে আল্লাহ তা‘আলার রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার নিকট সৎ অসৎ বিভিন্ন ধরণের লোক আসা যাওয়া করে। আপনি আপনার স্ত্রীগণকে পর্দা করার আদেশ দিলে খুবই ভাল হত। এই পরিপ্রেক্ষিতে এ আয়াত নাযিল হয়। (সহীহ বুখারী হা: ৪৭৯০১) এ পর্দার বিধান সম্পর্কে সূরা নূরে আলোচনা করা হয়েছে।

(لِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوْبِكُمْ وَقُلُوْبِهِنَّ)

‘এটা তোমাদের অন্তরের জন্য এবং তাদের অন্তরের জন্য অধিকতর পবিত্র উপায়’ অর্থাৎ পুরুষের মনে নারীর প্রতি যে আসক্তি আর নারীর মনে পুরুষের প্রতি যে আসক্তি তা থেকে পবিত্র থাকতে পারবে। ফলে উভয়ের মন পরিস্কার থাকবে কারো প্রতি কোন খারাপ ধারণা সৃষ্টি হবে না।

৩. তৃতীয় আরেকটি বিধান হল এই যে, রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর মৃত্যুর পর তাঁর স্ত্রীগণকে কারো জন্য বিবাহ করা হালাল নয়। কেননা তারা হল মু’মিনদের জন্য মাতৃতুল্য। তবে পর্দা করা জরুরী। এটা রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর স্ত্রীদের সম্মান।

এরপর বলেন যে, মানুষ যা কিছুই করুক না কেন। তা প্রকাশ্যে করুক অথবা অপ্রকাশ্যে করুক আল্লাহ তা‘আলা তা অবহিত আছেন।

সুতরাং গোপনে অপরাধ করে মনে করা যাবে না যে, কেউ জানে না। বরং আল্লাহ তা'আলা সকল কিছুই জানেন।

প্রায় এক বছর পরে সূরা নূরে যে সাধারণ হুকুম দেয়া হয় এটা তার ভূমিকা স্বরূপ। প্রাচীন যুগে আরবের লোকেরা নিসংকোচে একজন অন্যজনের ঘরে ঢুকে পড়তো। কেউ যদি কারো সাথে দেখা করতে চাইতো তাহলে দরজায় দাঁড়িয়ে ডাকার বা অনুমতি নিয়ে ভেতরে যাবার নিয়ম ছিল না। বরং ভেতরে গিয়ে গৃহকর্তা গৃহে আছে কি নেই স্ত্রী ও ছেলেমেয়েদের কাছে জিজ্ঞেস করে তা জানতে চাইতো। এ জাহেলী পদ্ধতি বহু ক্ষতির কারণ হয়ে পড়েছিল। অনেক সময় বহু নৈতিক অপকর্মেরও সূচনা এখান থেকে হতো। তাই প্রথমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের গৃহে এ নিয়ম জারী করা হয় যে, কোন নিকটতম বন্ধু বা দূরবর্তী আত্মীয়-স্বজন হলেও বিনা অনুমতিতে তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে পারবে না। তারপর সূরা নূরে এ নিয়মটি সমস্ত মুসলমানের গৃহে জারী করার সাধারণ হুকুম দিয়ে দেয়া হয়।

এ প্রসঙ্গে এটা দ্বিতীয় হুকুম। আরববাসীদের মধ্যে যেসব সভ্যতা বিবর্জিত আচরণের প্রচলন ছিল তার মধ্যে একটি এও ছিল যে, কোন বন্ধু বা পরিচিত লোকের গৃহে তারা পৌঁছে যেতো ঠিক খাবার সময় তাক করে। অথবা তার গৃহে এসে বসে থাকতো এমনকি খাবার সময় এসে যেতো। এহেন আচরণে গৃহকর্তা অধিকাংশ সময় বেকায়দায় পড়ে যেতো। মুখ ফুটে যদি বলে এখন আমার খাবার সময় মেহেরবানী করে চলে যান, তাহলে বড়ই অসভ্যতা ও রুঢ়তার প্রকাশ হয়। আর যদি খাওয়ায়, তাহলে হঠাৎ আগত কতজনকে খাওয়াবে। যখনই যতজন লোকই আসুক সবসময় সঙ্গে সঙ্গেই তাদের খাওয়াবার ব্যবস্থা করার মতো সামর্থ্য সবাই রাখে না। আল্লাহ এ অভদ্র আচরণ করতে তাদেরকে নিষেধ করেন এবং হুকুম দেন, কোন ব্যক্তির গৃহে খাওয়ার জন্য তখনই যেতে হবে যখন গৃহকর্তা খাওয়ার দাওয়াত দেবে। এ হুকুম শুধুমাত্র নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য নির্দিষ্ট ছিল না বরং সেই আদর্শগৃহে এ নিয়ম এজন্যই জারী করা হয়েছিল যেন তা মুসলমানদের সাধারণ সাংস্কৃতিক জীবনের নিয়মে ও বিধানে পরিণত হয়ে যায়।

এটি আরো একটি অসভ্য আচরণ সংশোধনের ব্যবস্থা। কোন কোন লোক খাওয়ার দাওয়াতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে এমনভাবে ধরণা দিয়ে বসে চুটিয়ে আলাপ জুড়ে দেয় যেন আর উঠবার নামটি নেই, মনে হয় এ আলাপ আর শেষ হবে না। গৃহকর্তা ও গৃহবাসীদের এতে কি অসুবিধা হচ্ছে তার কোন পরোয়াই তারা করে না। ভদ্রতা জ্ঞান বিবর্জিত লোকেরা তাদের এ আচরণের মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও কষ্ট দিতে থাকতো এবং তিনি নিজের ভদ্র ও উদার স্বভাবের কারণে এসব বরদাশত করতেন। শেষে হযরত যয়নবের ওলিমার দিন এ কষ্টদায়ক আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যায়। নবী করীমের ﷺ বিশেষ খাদেম হযরত

আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেনঃ রাতের বেলা ছিল ওলিমার দাওয়াত। সাধারণ লোকেরা খাওয়া শেষ করে বিদায় নিয়েছিল। কিন্তু দু'তিন জন লোক বসে কথাবার্তায় মশগুল হয়ে গিয়েছিলন। নবী ﷺ বিরক্ত হয়ে উঠলেন এবং পবিত্র স্ত্রীদের ওখান থেকে এক চক্কর দিয়ে এলেন। ফিরে এসে দেখলেন তারা যথারীতি বসেই আছেন। তিনি আবার উঠে গেলেন এবং হযরত আয়েশার কামরায় বসলেন। অনেকটা রাত অতিবাহিত হয়ে যাবার পর যখন তিনি জানলেন তারা চলে গেছেন তখন তিনি হযরত যয়নবের (রা.) কক্ষে গেলেন। এরপর এ বদ অভ্যাসগুলো সম্পর্কে লোকদেরকে সতর্ক করে দেয়া স্বয়ং আল্লাহর জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়লো। হযরত আনাসের (রা.) রেওয়ায়াত অনুযায়ী এ আয়াত সে সময়ই নাযিল হয়। (মুসলিম, নাসাঈ ও ইবনে জারীর)

এ আয়াতকেই হিজাব বা পর্দার আয়াত বলা হয়। বুখারীতে হযরত আনাস ইবনে মালেকের (রা.) উদ্ধৃত হয়েছে উমর (রা.) এ আয়াতটি নাযিল হবার পূর্বে নবী করীমের ﷺ কাছে নিবেদন করেছিলেনঃ হে আল্লাহর রসূল! আল্লাহর রসূল! আপনার এখানে ভালোমন্দ সবরকম লোক আসে। আহা, যদি আপনি আপনার পবিত্র স্ত্রীদেরকে পর্দা করার হুকুম দিতেন। অন্য এক বর্ণনায় বলা হয়েছে, একবার হযরত উমর (রা.) নবী করীমের ﷺ স্ত্রীদের বলেনঃ "যদি আপনাদের ব্যাপারে আমার কথা মেনে নেয়া হয় তাহলে আমার চোখ কখনোই আপনাদের দেখবে না।" কিন্তু রসূলুল্লাহ ﷺ যেহেতু আইন রচনার ক্ষেত্রে স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন না, তাই তিনি আল্লাহর ইশারার অপেক্ষায় ছিলেন। শেষ পর্যন্ত এ হুকুম এসে গেলো যে, মাহরাম পুরুষরা ছাড়া (যেমন সামনের দিকে ৫৫ আয়াতে আসছে) অন্য কোন পুরুষ নবী করীমের ﷺ গৃহে প্রবেশ করবে না। আর সেখানে মহিলাদের কাছে যারই কিছু কাজের প্রয়োজন হবে তাকে পর্দার পেছনে থেকেই কথা বলতে হবে। এ হুকুমের পরে পবিত্র স্ত্রীদের গৃহে দরজার ওপর পর্দা লটকে দেয়া হয় এবং যেহেতু নবী করীমের ﷺ গৃহ সকল মুসলমানের জন্য আদর্শগৃহ ছিল তাই সকল মুসলমানের গৃহের দরজায়ও পর্দা ঝোলানো হয়। আয়াতের শেষ অংশ নিজেই এদিকে ইঙ্গিত করছে যে, যারাই পুরুষ ও নারীদের মন পাক পবিত্র রাখতে চায় তাদেরকে অবশ্যই এ পদ্ধতি অবলম্বন করতে হবে।

এখন যে ব্যক্তিকেই আল্লাহ দৃষ্টিশক্তি দান করেছেন সে নিজেই দেখতে পারে, যে কিতাবটি নারী পুরুষকে সামনা সামনি কথা বলতে বাঁধা দেয় এবং পর্দার অন্তরাল থেকে কথা বলার কারণ স্বরূপ একথা বলে যে, "তোমাদের ও তাদের অন্তরের পবিত্রতার জন্য এ পদ্ধতিটি বেশী উপযোগী", তার মধ্যে কেমন করে এ অভিনব প্রাণপ্রবাহ সঞ্চার করা যেতে পারে, যার ফলে নারী পুরুষের মিশ্র সভা-সমিতি ও সহশিক্ষা এবং গণপ্রতিষ্ঠান ও অফিসসমূহে নারী-পুরুষের অবাধ মেলামেশা একেবারেই বৈধ হয়ে যাবে এবং এর ফলে মনের পবিত্রতা মোটেই প্রভাবিত হবে না? কেউ যদি কুরআনের বিধান অনুসরণ করতে না চায়, তাহলে সে তার বিরুদ্ধাচরণ করুক এবং পরিষ্কার বলে দিক আমি এর অনুসরণ করতে চাই না, এটিই তার জন্য অধিক যুক্তিসঙ্গত পদ্ধতি। কিন্তু কুরআনের সুস্পষ্ট বিধানের বিরুদ্ধাচরণ করবে এবং তারপর আবার বেহায়ার মতো বুক ফুলিয়ে বলবে, এটি ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা যা আমি উদ্ভাবন করে নিয়ে এসেছি-এটি বড়ই হীন আচরণ। কুরআন ও সুন্নাহর বাইরে কোন্ জায়গা থেকে তারা ইসলামের এ তথাকথিত শিক্ষা খুঁজে পেলেন?

সে সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিরুদ্ধে যেসব অপবাদ ছড়ানো হচ্ছিল এবং কাফের ও মুনাফেকদের সাথে সাথে অনেক দুর্বল ঈমানদার মুসলমানও তাতে অংশ গ্রহণ করতে শুরু করেছিলেন, এখানে সেদিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে।

সূরার শুরুতে "নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের স্ত্রীগণ হচ্ছেন মু'মিনগণের মা" বলে যে বক্তব্য উপস্থাপন হয়েছে এ হচ্ছে তার ব্যাখ্যা।

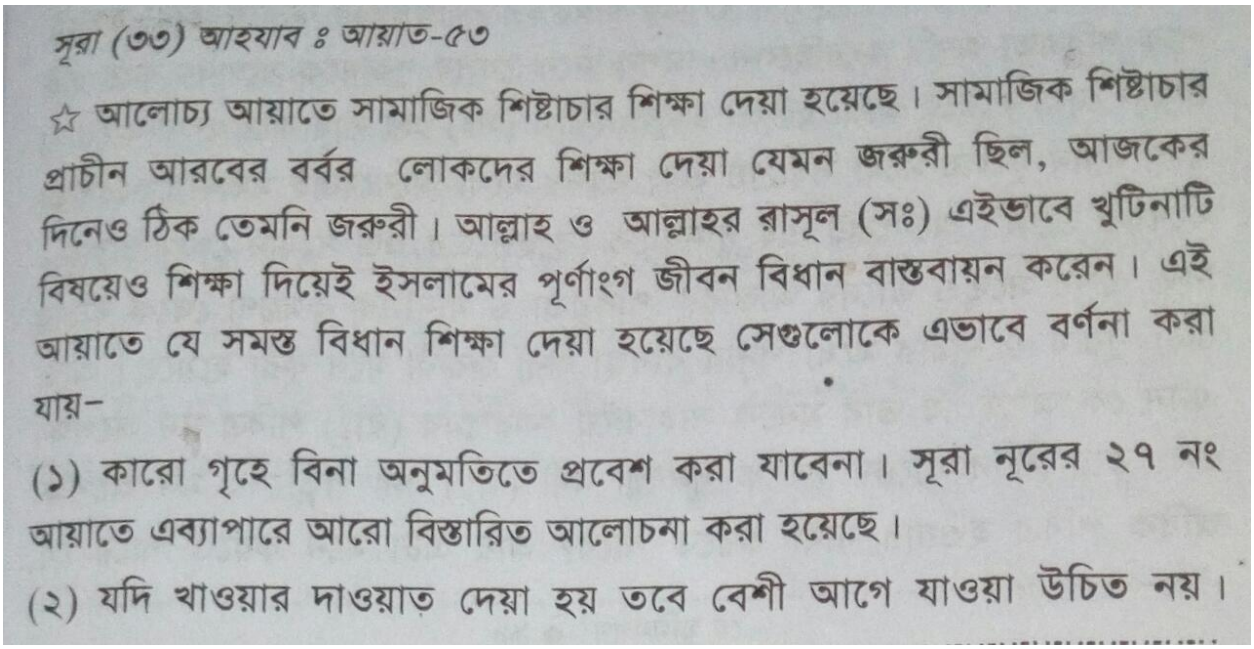

সূরা (৩৩) আহযাব ঃ আয়াত-৫৩

☆ আলোচ্য আয়াতে সামাজিক শিষ্টাচার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। সামাজিক শিষ্টাচার প্রাচীন আরবের বর্বর লোকদের শিক্ষা দেয়া যেমন জরুরী ছিল, আজকের দিনেও ঠিক তেমনি জরুরী। আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূল (সঃ) এইভাবে খুটিনাটি বিষয়েও শিক্ষা দিয়েই ইসলামের পূর্ণাংগ জীবন বিধান বাস্তবায়ন করেন। এই আয়াতে যে সমস্ত বিধান শিক্ষা দেয়া হয়েছে সেগুলোকে এভাবে বর্ণনা করা যায়–

(১) কারো গৃহে বিনা অনুমতিতে প্রবেশ করা যাবেনা। সূরা নূরের ২৭ নং আয়াতে এব্যাপারে আরো বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

(২) যদি খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয় তবে বেশী আগে যাওয়া উচিত নয়।

আপনাকে খাওয়ার দাওয়াত দেয়া হয়েছে খাওয়া প্রস্তুতের দাওয়াত দেয়া হয়নি।

(৩) সময় মত যেতে হবে যাতে আপনি তখনই প্রবেশ করবেন যখন আপনার উপস্থিতি আশা করা হচ্ছে।

(৪) খাওয়ার পরে অথবা গল্পগুজব করে সময় নষ্ট করে দাওয়াতকারীর অসুবিধা ও বিরক্তি উৎপাদন করা যাবেনা।

(৫) পরিবেশ পরিস্থিতি বুঝে নিতে হবে। কারণ মেজবান হয়তো ভদ্রতার খাতিরে চলে যেতে বলতে পারছেন না। এর সবগুলোরই একটি সামাজিক ও অধ্যাত্মিক গুরুত্ব রয়েছে। অপরকে শ্রদ্ধা করা এবং মার্জিত ব্যবহার করা উত্তম চারিত্রিক গুণ।

যদিও একথাগুলো রাসূল (সঃ) এবং তাঁর ঘরকে নিয়ে বলা হয়েছে কিন্তু এগুলো সাধারণভাবে সকলকে শিক্ষা দেয়া হয়েছে। অতঃপর এই আয়াতে পর্দার বিধান বর্ণনা করা হয়েছে।

নবী করীম (সাঃ) এর ঘরের স্ত্রীলোকদের কাহারো নিকট কাহারো কোন কাজ থাকলে সে পর্দার আড়াল থেকে কথা বলবে। এই নির্দেশ আসার পর রাসূল (সঃ) এর স্ত্রীদের ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে দেয়া হয়। আর রাসূল (সঃ) এর ঘর যেহেতু সব মুসলমানদের জন্যই আদর্শ এই কারণে দেখাদেখি সব মুসলমানরাই ঘরের দরজায় পর্দা টানিয়ে দিলেন।

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় রাসূল (সঃ) এর পূন্যাত্মা পত্মীগণকে পর্দার বিধান দেয়া হয়েছে যাদের অন্তরকে পাক সাফ রাখার দায়িত্ব আল্লাহ তা'আলা স্বয়ং গ্রহণ করেছেন। এবং রাসূল (সঃ) এর ঘনিষ্টতম সংশ্লিষ্টতার কারণে তারা স্বত:ই পাক পবিত্রতা অর্জন করেছিলেন। অপর দিকে যেসব পুরুষকে সম্বোধন করে এই বিধান দেয়া হয়েছে তারা হচ্ছেন রাসূল করীম (সঃ) এর সাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) যারা মানব কুলের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ এবং যাদের মধ্যে অনেকেরই মর্যাদা ফেরেশতা গণেরও উর্ধ্বে। অনেকেই এই দুনিয়াতে বেহেশতের শুভ সংবাদ পেয়েছিলেন। কিন্তু এসব সত্বেও তাঁদের আন্তরিক পবিত্রতা ও মানসিক কুমন্ত্রণা থেকে বাঁচার জন্য পুরুষ ও নারীর মধ্যে পর্দার ব্যবস্থা করা জরুরী মনে করা হয়েছে। আজ এমন কে আছে যে তার মনকে সাহাবায়ে কেরামের (রাঃ) পবিত্র মন অপেক্ষা এবং তার স্ত্রী কন্যাদের মনকে পূন্যত্মা নবী (সঃ) এর পত্নীদের মন অপেক্ষা অধিক পবিত্র হওয়ার দাবী করতে পারে? আর এটা মনে করতে পারে যে,

নারীদের সাথে তাদের খোলামেলা মেলামেশা কোন অনিষ্টের কারণ হবেনা। এখন আল্লাহর দেয়া দৃষ্টি লাভ করেছে এমন প্রতিটি নারী পুরুষই দেখতে পাবে যে, যে মহান কিতাব স্ত্রীলোকদের পুরুষের সামনা সামনি ও মুখোমুখি হয়ে কথা বলা নিষেধ করে আর পর্দার আড়ালে দাঁড়িয়ে কথা বলার এই যুক্তি পেশ করে যে, "তোমাদের ও তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা রক্ষা করার এটাই উপযুক্ত পন্থা" সে গ্রন্থ হতে নারী পুরুষের মিলিত বৈঠক, সভা-সমিতি, সহশিক্ষা এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও অফিস আদালতে নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার জায়েয হওয়ার কথা কি করে বের করা যেতে পারে? আর তা করা হলে তাদের হৃদয়ের পবিত্রতা নষ্ট না হওয়ার কি কারণ থাকতে পারে?

অতঃপর আলোচ্য আয়াতে রাসূল (সঃ)-এর মর্যাদা ও তাঁর স্ত্রীদের মর্যাদা আলোচনা করা হয়েছে। রাসূল (সঃ) এর মর্যাদা বিবেচনা করলে দেখা যায় সকলে উপর সর্ব্বোচ্চ মর্যাদায় আসীন হওয়া তাঁর নূন্যতম প্রাপ্য। তার মর্যাদার বিষয় আলোচনার জন্য একটি স্বতন্ত্র বই এর প্রয়োজন। আল্লাহর ঘোষণা তাঁকে সামান্যতম কষ্ট দেয়া কারো জন্য বৈধনয়, এবং যেখানে তিনি নিজের অসুবিধার কথা প্রকাশ করেননি সেখানে আল্লাহপাক নিজেই তা বর্ণনা করে সকলকে সতর্ক করে দিয়েছেন- আলোচ্য আয়াতের এই বাক্যগুলো থেকেই তা স্বত:ই প্রকাশিত হয়। অতএব তাঁর এই অতুলনীয় মর্যাদার দাবী এই যে তাঁকে সামান্যতম ব্যাথা দিতে পারে অথবা বিরক্ত করতে পারে এমন কোন কিছু করা উচিত নয়। এটা শুধু তাঁর জীবদ্দশায়ই নয় এখনো সমভাবে প্রযোজ্য। কারণ তাঁর শিক্ষা এবং ব্যক্তিত্ব এখনো আমাদের কাছে জীবন্ত। তাঁর ওফাতের পর তাঁর স্ত্রীদের সাথে কারো বিবাহ বৈধ নয়। এটা তাঁর এবং স্ত্রীদের মর্যাদার কারণেই প্রযোজ্য। তাছাড়া তাদেরকে মুমিনাগণের মায়ের মর্যাদায় আসীন করা হয়েছে। ইতিহাসে তাঁদের এই সম্মান যথাযথভাবে রক্ষিত হয়েছে।

আয়াত হতে শিক্ষণীয় বিষয়:

১. অনুমতি ব্যতীত কারো গৃহে প্রবেশ করা যাবে না।

২. কেউ কাউকে দাওয়াত দিলে তা কবূল করতে হবে।

৩. মহিলাদের সাথে তেমন জরুরী প্রয়োজন থাকলে পর্দার আড়াল থেকে প্রয়োজন মেটাতে হবে।

৪. আল্লাহ তা'আলা সকল বিষয়ের ওপর খবর রাখেন, তা প্রকাশ্যে হোক বা অপ্রকাশ্যে হোক।

৫. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর স্ত্রীগণ মু'মিনদের জন্য মাতৃতুল্য, তাই তাদেরকে বিবাহ করা হারাম।

৬. রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কষ্ট পান এমন কাজ থেকে বিরত থাকতে হবে।